ভোটাধিকার থেকে গণআকাঙ্ক্ষা: নির্বাচনের ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। আবার আইনসভা এবং বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলিতে নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক প্রকাশ্য বা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। ভোট বা নির্বাচনের ধারণাটি আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ, নেতৃত্ব নির্বাচন এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হলো এই নির্বাচন প্রথা। দেশে দেশে বড় এবং ঐতিহাসিক অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে ভোটের মাধ্যমে। নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমানে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসনকাজে অংশ নেন সাধারণ জনগণ। আর তাই গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ নির্বাচন। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে এই পদ্ধতির চালু রয়েছে নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সকল আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই কোনো এক ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ধরন ছিল প্রায় অভিন্ন।

নির্বাচন ছিল প্রাচীন গ্রিসীয় শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং সেখানে সাধারণত লটারির মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন হতো। ইতিহাসবিদদের মতে প্রাচীন গ্রীসের অ্যাথেন্স শহরে ৪০৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত। অনেক ঐতিহাসিক এই সময়টিকেই গণতন্ত্রের জন্মকাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সে সময় গ্রীসের শাসন পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন প্রচলিত ছিল। সেই থেকে প্রাচীন গ্রিসে গণতন্ত্রের প্রাথমিক রূপটি দৃশ্যমান হতে থাকে। গ্রিক সাম্রাজ্যে ভোটার তালিকাও ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৫-৫২৪ অব্দে গ্রিক শাসক ছিলেন ক্লিসথেনি। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে তার শাসনামলের দুর্লভ ভোটার তালিকা পাওয়া গেছে। গবেষণা বলছে, প্রাচীন এথেনিয়ান ডেমোক্রেসির সিটি স্টেট নির্বাচনে এ ভোটার তালিকা ব্যবহার করা হয়। তখন শুধু এলিট ক্লাস বা উচ্চ শ্রেণির পুরুষরা ভোট দেওয়ার উপযুক্ত বলে গণ্য হতেন। গ্রিক সভ্যতার পর, রোমান প্রজাতন্ত্রে (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২৭) দেখা যায় আরও উন্নত ও কাঠামোবদ্ধ নির্বাচনী ব্যবস্থা। এখানে 'কমিতিয়া' নামে একটি পরিষদ ছিল, যেখানে নাগরিকরা কনসাল, প্রেটর, সেনেটর প্রভৃতি প্রতিনিধি নির্বাচন করতেন।

ভোটদানের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় রোমেও। প্রাচীন রোমে ১৩৭ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের ভোটার তালিকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভোটের মাধ্যমেই নেতা নির্বাচন করতেন রোমের অধিবাসীরা। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের ধারণা মজবুত হতে থাকে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে। তারও পরে চালু হয় ভোটদান প্রথা। ভোটদানের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় রোমেও।

মুঘল শাসন বিধানে স্থানীয় জনগণের মনোনীত ব্যক্তিরা স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন। বাংলায় গ্রামের লোকেরা নিজ নিজ গ্রামের মোকাদ্দম বা গ্রামপ্রধান, পাটোয়ারী বা কর আদায়কারী নির্বাচন করতেন। ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত প্রচলিত গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল স্থানীয় প্রশাসনের নির্বাচনধর্মী বৈশিষ্ট্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পঞ্চায়েত প্রথা বহাল ছিল।

আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের ফলে ঐতিহ্যগত নির্বাচন পদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছে। নির্বাচন এখন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সূচিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন নির্বাচনী আইনের (যেমন ১৬৯৪ সালের ট্রিনিয়্যাল অ্যাক্ট এবং ১৭১৬ সালের সেপ্টেনিয়্যাল অ্যাক্ট) মাধ্যমে এর নিয়মিতকরণ সম্পন্ন হয় এবং উনিশ শতকে পরপর প্রণীত সংস্কার বিলগুলির আওতায় ভোটাধিকারের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। ১৮৭২ সালে গোপন ব্যালট পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং অবশেষে ১৯২৮ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান চালু হয়।

'দ্য স্পিরিট অব লজ' বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মন্টেসকিউই বলেছেন যে 'প্রজাতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র যে কোনো ক্ষেত্রের ভোটেই হয় দেশের প্রশাসক হও অথবা প্রশাসনের অধীনে থাকো এই দুটি অবস্থার মধ্যেই পর্যায়ক্রমে ভোটারদের থাকতে হয়। নিজেদের দেশে কোন সরকার আসবে তা বাছাই করার 'মালিক' বা 'মাস্টার' হিসেবে কাজ করে ভোটাররাই, ভোট দিয়ে একটি সার্বভৌম ব্যবস্থাকে চালু রাখে জনসাধারণই।' তবে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ও সরকার গঠনের ধারণা আসে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। ধীরে ধীরে নির্বাচনী আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে পুরো বিশ্বে এই প্রক্রিয়া আরও অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। ১৮৭২ সালে গোপন ব্যালট পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং ১৯২৮ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান চালু হয়।

ভোটাধিকার চর্চা বা গণতন্ত্র চর্চায় যারা মোটামুটি এগিয়ে ছিল তারাও প্রাথমিক পর্যায়ে, এমনকি তারও অনেক পর পর্যন্ত নারীদের ভোটার করেনি। আজকের অনেক উন্নত আধুনিক রাষ্ট্রও দীর্ঘকাল নারীর ভোটের অধিকার অস্বীকার করেছে। ভোটাধিকার পেতে নারীকে প্রতিবাদী হতে হয়েছে। ১৯২০ সালের পর থেকে বিভিন্ন দেশে নারীদের ভোটার হিসেবে ভাবা শুরু

হয়। তবে, ১৮৯৩ সালেই নিউজিল্যান্ডের নারীরা ভোটের অধিকার পেয়েছেন। যদিও তখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না তারা। ১৯১৮ সালে ব্রিটেন ও ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা ভোটের অধিকার পান।

বেলজিয়াম বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যারা ১৮৯২ সালে পুরুষদের জন্য এবং ১৯৪৯ সালের নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক ভোটের ব্যবস্থা চালু করে। এখন পর্যন্ত মোট ২২টি দেশে এই নিয়ম চালু আছে। কিছু কিছু দেশে ভোটদান বাধ্যতামূলক ছিল এবং ভোট প্রদান না করলে শাস্তির বিধানও ছিল। অস্ট্রেলিয়াতে ভোট না দেওয়ার শাস্তি হিসেবে গুণতে হবে ২০-৫০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা। আবার বেলজিয়ামে প্রথমে ৩০-৬০ ইউরো জরিমানা করা হবে। চারবারের বেশি ভোট প্রদানে ব্যর্থ হলে দশ বছরের জন্য ভোটাধিকার হারাতে হতে পারেন। এছাড়াও সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও নানাবিধ সমস্যা হতে পারে। তবে বেলজিয়ামে নিজে উপস্থিত না থেকেও প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ আছে। ব্রাজিল এবং ইকুয়েডরে বাধ্যতামূলক ভোটের ব্যবস্থা নিরক্ষরদের জন্য শিথিল করা হয়েছে। ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনায় বাধ্যতামূলক ভোটের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তা সত্ত্বেও ১৬-১৭ বয়স পর্যন্ত ভোট দেয়া বাধ্যতামূলক না। তবে ১৮ বছর বয়স থেকে ভোট না দিলে জরিমানা গুণতে হবে।

১৯২০ সাল পর্যন্ত অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত দেশ এবং উত্তর আমেরিকার গণতন্ত্রে সর্বজনীনভাবেই পুরুষ ভোটাধিকার চালু ছিল এবং তার পর থেকেই বহু দেশ মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। পুরুষদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের কথা আইনগতভাবে সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময়েই অবাধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাধা অন্তরায় সৃষ্টি করতো।

মোটামুটি বিশ্বের প্রায় ২০৫টি দেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর হতে হয়। বিশ্বের ১১ টি দেশে যেমন: ব্রাজিল,অস্ট্রিয়া, ইকুয়েডর; আর্জেন্টিনার ১৬ বছরের কিশোর-কিশোরীদের ভোট দিতে পারেন । ইন্দোনেশিয়া এবং ডমেনিক রিপাবলিকে ভোটার হতে বয়স যথাক্রমে ১৭ এবং ১৮ বছর হতে হবে। তবে বিবাহিতরা যেকোনো বয়সে ভোট দিতে পারে। উল্লেখ্য, দুটো দেশেই বাল্যবিবাহের হার অধিক। ২০০৭ এর আগে ইরানে ১৬ বছর থেকে ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল। ২০০৭ সালে তা পরিবর্তন করে করা হয় ১৮ বছর এাড়াও বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় ১৮ বছর বয়স থেকেই ভোটের অধিকার পায় সবাই। তবে আরব আমিরাতে ভোট দিতে চাইলে বয়স ন্যূনতম ২৫ বছর হতে হবে। ১৮৯০ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র , যা সাধারণত ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত, প্রথম ভোটদানের বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করে।

বাংলায় নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুরূপভাবে বিকশিত হয়নি। ১৮৬৮ সালে পৌর আইন (৬নং আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে পাশ্চাত্য ধরনের পৌর কমিটি গঠনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। ১৮৮৪ সালে প্রবর্তিত ৩ নং আইন বলে ঢাকাসহ বাংলার গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভাসমূহ নির্বাচনী ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়। একই আইনে আংশিক নির্বাচন ও আংশিক মনোনয়নের ভিত্তিতে জেলা কমিটি ও স্থানীয় বোর্ডসমূহ গঠিত হয়।

বাংলায় ৭৫০ থেকে ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। তিনিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। চলমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা নিরসনে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকৃতিপুঞ্জ বা বাংলার প্রধান নাগরিকরা গোপাল নামের সামন্ত এই নেতাকে বাংলার রাজপদে নির্বাচিত করেন। আর ভারতবর্ষে নারীদের ভোটার করার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯১৭ সালের দিকে। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস মতে, ওই বছর ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন ব্রিটিশ নারী অ্যানি বেসান্ত। তিনিই উদ্যোগী হয়ে আইন সংশোধন করেন। কয়েক বছর পর ১৯২০ সালে ব্রিটিশ ভারতে ইমপিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইলেকশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় প্রোভেন্সিয়াল কাউন্সিল ইলেকশনও। দুই নির্বাচন সামনে রেখে একাধিক প্রদেশে ভোটাধিকার প্রদান করা হয় নারীদের।

সূচনালগ্ন থেকেই বাংলার জনগণ নির্বাচনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ঢাকা পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনের বিধান প্রবর্তিত হয়। ভোটাধিকার সম্প্রসারণের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল জনগণের দাবির ফল। কিন্তু প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থায় জনগণের আগ্রহ সত্ত্বেও পাশ্চাত্য ধাঁচের নির্বাচন বাংলায় কখনও সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর হয়নি। লক্ষণীয় যে, ভারতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো ঔপনিবেশিক শাসকের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঔপনিবেশিক, সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। তাই ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় সরকার সর্বদাই নির্বাচনকে স্থানীয় অনুগত প্রভাবশালী মহল, বিশেষ করে জমিদারদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট ছিল। ১৯৩৫ সাল অবধি পৌরসভা, স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি ও বোর্ডে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ক্ষেত্রেই জমিদারদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এমন কি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনেও তাদের প্রভাব বজায় ছিল।

নির্বাচনের ইতিহাসে রাজনৈতিক মেরুকরণের ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০ সাল পর্যন্ত দলীয় মনোনয়ন ছাড়াই প্রার্থীরা ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এমন কি ১৯৩৭ সালের নির্বাচন দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ২৫০ আসনের মধ্যে ৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী (মুসলিম ৪৩, হিন্দু ৩৯) জয়ী হন। নির্বাচনের ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীদের মধ্যে তখনও তেমন রাজনৈতিক মেরুকরণ ছিল না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত করে। প্রায় ৩০০

প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তাদের মধ্যে মাত্র ৮ জন (হিন্দু ৬ ও মুসলিম ২) নির্বাচিত হন। এভাবেই স্বতন্ত্রপ্রার্থীদের নির্বাচনের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী সকল নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সাফল্য ছিল একান্তই ব্যতিক্রম।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যতগুলো সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বেশিরভাগ নির্বাচন হয়েছে একতরফা এবং ক্ষমতাসীন দলের পছন্দমাফিক। অতীতের বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গেছে ক্ষমতাসীন দল তাদের পছন্দ অনুযায়ী 'বিরোধী দল' ঠিক করতে চেয়েছে এবং সে অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজন করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর হিন্দুদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ, জমিদারি প্রথার বিলোপ এবং ১৯৫৬ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান প্রবর্তনের ফলে বিভাগপূর্ব নির্বাচন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ ও জেলা বোর্ড নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে নবীন ও অনাবাসিক আইনজীবীরা প্রাধান্য বিস্তার করে। ষাট ও সত্তরের দশকে এ প্রক্রিয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং তখন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পেশাদার রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৯১ ও ২০০১ সালের নির্বাচনই অধিক গ্রহণযোগ্য ছিল। বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মুখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন দুটি স্বাভাবিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কিন্তু তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। নির্বাচনের তথ্যবিবরণী বাংলাদেশে এ যাবত বারটি সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৬ (১৫ ফেব্রুয়ারি), ১৯৯৬ (১২ জুন), ২০০১, এবং ২০০৮,২০১৪,২০১৮,২০২৪ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঘূর্ণনের আবর্তে ১৯৭৩,১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালের এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ২০২৪ সাল পর্যন্ত একই ধারায় ফিরে এসেছিল।

সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত, যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এ ধরনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন। ২০০৭ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত 'টিআইবি' নির্বাচন কমিশন ও বিভিন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা করে আসছে। এসব গবেষণায় দেখা যায় বেশিরভাগ জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একচ্ছত্র আধিপত্য ও প্রভাব এবং নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে ক্রমাগতভাবে জনগণের মধ্যে নির্বাচনের প্রতি অনীহা তৈরি হয়েছে, যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে ভোটার উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নমুখী হওয়ার মধ্যে।

বিগত বছরগুলোতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে বিএনপিসহ অপরাপর রাজনৈতিক দল আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় তারা গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য বিগত ১৭ বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলো মধ্যে বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিএনপিকে আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন হলো জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মূল স্তম্ভ, যা রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। বস্তুত জনআকাঙ্ক্ষা ও নির্বাচন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। কারণ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। জাতীয় নির্বাচন শুধু একটি ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া নয়। এটি জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধার ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থার প্রতীক।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, নির্বাচনের প্রাক্কালে যাতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে, সেদিকে ভোটার ও জনগণকে খেয়াল রাখতে হয়। একমাত্র জনগণই পারে উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে। এভাবে সকলের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকর হলেই উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। দেশের জনগণ নির্বাচনের প্রাক্কালে যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হয় সেদিকে লক্ষ রাখবে।

#

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা ভূমি মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার